ঐতিহাসিকের ইতিহাস:
তপন রায়চৌধুরী (১৯২৬–২০১৪)

গৌতম ভদ্র

এই রচনাটি প্রয়াত ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরী সম্পর্কে কোনো স্মৃতি আলেখ্য নয়, অতীত ব্যক্তি সম্পর্কের স্রোতে উজান বাওয়ার কোনো অধিকার ও ক্ষমতা আমার নেই। আমি কোনোদিন তাঁর ছাত্র নই। কর্মজীবনে পেশাদারি সূত্রে আলোচনা সভায় তাঁর বক্তৃতা শুনেছি মাত্র, হয়তো বা কয়েকবার তর্ক হয়েছে। জীবনে একবারই বিশেষ কাজের সূত্রে তাঁর বাড়ি গিয়েছিলাম, অকস্‌ফোর্ডে, অল্প কিছুক্ষণের জন্য। ২০১১–১৩ সালে জাতীয় গ্রন্থাগারে টেগোর ন্যাশনাল ফেলোরূপে গবেষণা করার সময় দেখেছি যে শীতকালে তপন রায়চৌধুরী তাঁর নিজস্ব গবেষণার সূত্রে গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আসনে বসতেন, ঘটনাচক্রে আসনটি আমার পড়ার ঘরের পাশেই ছিল। দুপুরে তাঁর সঙ্গে অল্পবিস্তর আড্ডা ও চা খাওয়া হত। উনিই বক্তা, আমি শ্রোতা। আসরে মাঝে মাঝে হাজির থাকতেন রজতকান্তি সূর, অদিতিনাথ সরকার বা ইন্দিরা বিশ্বাস। এত স্বল্প স্মৃতির পুঁজি নিয়ে কারুর সম্পর্কে আপন কথা লেখা সম্ভব নয়। তবে বরাবরই তপন রায়চৌধুরীর রচনার আগ্রহী ও অনুরাগী পাঠক আমি, ইতিহাস শিক্ষক হবার জন্য তাঁর ইংরেজি রচনাগুলি আমার অজানা নয়, আর নিজের মাতৃভাষার আগ্রহী পাঠক হবার জন্য তাঁর বাংলায় লেখা প্রবন্ধগুলি আমি গোগ্রাসে পড়েছি। এই পড়াশুনার সুবাদেই লেখাটা তৈরি হয়েছে মাত্র।

অমিত রায়ের কাছ থেকে শোনা ছিল যে বিদ্যা হল কমলহীরে, আর তার থেকে যে আলো ছিটকে বেরোয়, সেটা কালচার। বিদ্যা আর কালচারের অন্বয়ে তপন রায়চৌধুরীর রচনা বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, এটাই পড়তে পড়তে বার বার মনে হয়। দেশবিভাগ ও স্বাধীনতার মুহূর্তে তপনবাবু তাঁর ইতিহাস সাধনা শুরু করেন, ঐ সন্ধিক্ষণটির তাৎপর্য নিয়ে পরবর্তী সময়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন। পঞ্চাশের দশকে ভারতের নতুন শাসনব্যবস্থা বিন্যাসে সরকারি চাকুরি পাওয়া কৃতি বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে তুলনামূলকভাবে সুগম হয়, তাঁর সমসাময়িক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্সির উজ্জ্বল ছাত্ররা স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্রে যোগ দেন, ইংরেজ শাসন পরবর্তী প্রশাসন কাঠামো তৈরি করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অন্যপক্ষে, তিনি ও সুহৃদ অরুণ দাশগুপ্ত–এর মতো হাতে গোনা কয়েকজন সফল ছাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ বেছে নেন। মাইনে কম, কিন্তু নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের উৎসাহে ইতিহাস বিদ্যাতে নেশা ধরেছে, ঐ নেশাকেই পেশা করতে এঁরা বদ্ধপরিকর ছিলেন। দেশ ছেড়ে এসেছেন, জমিদারি নেই, পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের টাকার প্রয়োজন আছে কিন্তু বাঙালি সারস্বত সাধনার কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে তপনবাবুর উৎসাহে ও পরিশ্রমে খামতি ছিল না। কারণ সেই যৌবনেই তপনবাবু নিশ্চিত হয়েছিলেন যে পড়া, পড়ানো আর সুবিধামত ইতিহাস নিয়ে লেখালিখিই তাঁর স্বধর্ম, অন্য কিছু পরধর্ম। বিংশ শতকীয় ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার আওতায় বেড়ে ওঠা যদুনাথ সরকার, নীহাররঞ্জন রায়, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বা সুকুমার সেনের মতো জ্ঞানসাধকের সান্নিধ্যে তিনি এসেছিলেন। ঐহিক প্রাপ্তির উর্ধ্বে 'শুদ্ধ জ্ঞানচর্চা'র পথের পথিক এঁরা, তপনবাবুর মতে, জ্ঞান সম্পর্কে একটি 'রোমান্টিক' ধারণায় এঁরা অনুপ্রাণিত, হয়তো বা ঔপনিবেশিক আবেষ্টনীতে শুদ্ধ জ্ঞানচর্চার পরিসরেই এঁরা আত্মশক্তি ও স্বাজাত্যভিমানের সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছিলেন। বিদ্যাচর্চার এই ঐতিহ্যের প্রতি পরম শ্রদ্ধা রেখেও তপন রায়চৌধুরীর প্রজন্মের মেধাজীবীরা নতুন ভারত গড়ার কর্মকাণ্ডে ভারতবিদ্যার অর্থ খুঁজছিলেন। তাঁর মতে নেহরুর 'ভারত–আবিষ্কার'–এ সেই খোঁজার নান্দীপাঠ শোনা যায়। সেই পাঠে জাতীয়তাবাদ পুরোপুরি সুস্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠ। ইতিহাসচর্চায় এই ভারতচিন্তা বিশিষ্ট এবং অনন্য ভারতীয়ত্বর সন্ধানকে ক্রমে অবান্তর করে তোলে। 'এই আত্মসচেতনতা সুস্থ যা মানুষের বহু বিচিত্র ঐতিহ্যকে সহজে ও সানন্দে গ্রহণ করে নিজের বিশিষ্ট সংস্কৃতিকে শ্লাঘা নয়, আনন্দের বস্তু বলে ভোগ করতে পারে।' বাক্যটি সারগর্ভ, শব্দটির ওজন আছে। স্বাধীনতা–উত্তর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে সংস্কৃতি চর্চায় আত্মাভিমান ও স্বাজাত্যরক্ষার নিছক দায় ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর পরিচয়ে অহেতুক পিছুটান বলে মনে হতে পারে, সেই চিন্তা তার মেধা চর্চাকে অযথা রক্ষণশীল করে তুলবে। কী পারতাম নয়, বরং কী পারি সেটাই করে দেখানোটা জরুরি হয়ে উঠল, তাতেই জগতের তুলনায় নিজের সঠিক মাপ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে। নিজের কালচারে নিছক গর্ব নয়, বরং তাকে ভোগ করা, সংস্কৃতি চর্চায় আত্মবিশ্বাসী ও আনন্দিত হওয়াই স্বাধীনতাকে স্বাদু করে তোলবার অন্যতম শর্ত। তপনবাবু স্পষ্ট বলেছেন যে মূল্যবোধের নিরিখে ইতিহাস চর্চায় ভারত–সংস্কৃতির এই চিন্তাকে শ্রেয় বলা 'এলিটিজম'। এই সাংস্কৃতিক রূপচিন্তা শিক্ষিত ভারতীয়ের সর্বজনীন চিন্তাও নয়। তবুও অধুনা যুগের ভারতচিন্তায় এই গোত্রের চেতনার প্রকাশকেই তিনি শ্রেষ্ঠ বলে

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

মনে করতেন, তাঁর নিজস্ব সাংস্কৃতিক বোধ পুরোপুরি এই চিন্তাতে প্রোথিত ছিল।

এই ভারতবোধই তপনবাবুর জীবন ও ইতিহাসচর্চায় নানাভাবে প্রকীর্ণ আছে, ভারত ইতিহাসে ঐ বোধের নানা উৎস অনুসন্ধানে তাঁর পথপরিক্রমা মাঝে মাঝে এদিক ওদিকে বাঁক নিয়েছে। বরিশালের স্কুলে যে ইতিহাস পাঠ শুরু হয়েছিল, প্রায় আশি বছর ধরে সেই পড়া চলতেই থাকে, কখনও কলকাতায়, আচার্য যদুনাথ সরকারের কাছে শিক্ষানবিশিতে, কখনও হেগ শহরের ওলন্দাজ আর্কাইভসে, কিংবা দিল্লি, অকস্‌ফোর্ডে বা পেনসিলভেনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতীয় ইতিহাসে সুস্থ ভারতচিন্তার প্রকাশসন্ধানেই তিনি একধারে বাঙাল ও অন্যধারে, আজকের ভাষায়, গ্লোবাল। তাঁর ভাবনার ভারতটি বহুধা বিস্তৃত, নানারূপে বিধৃত, চৈতন্যের বোধনে ও বিকাশে বরিশাল আর অকস্‌ফোর্ড দুটিই নিজ গুণে মান্য। তাই স্থান থেকে স্থানান্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে পরিক্রমার সময় তিনি তাঁর ঐতিহাসিক প্রশ্নের দিশাটি হারাননি, কী করে প্রত্যন্ত প্রদেশে, উপকূলের অর্থনীতিতে বা সাধারণ দেশি মানুষের জীবনে বা সমাজের বৌদ্ধিক চিন্তায় দূর সভ্যতার বীজ এসে পড়ে, বহমান ঐতিহ্যে গৃহীত হয়ে আবার সেই ধারাকেই পরিবর্ধিত করে, কোন কোন বিশেষ সূত্রে ক্ষুদ্রের অবয়বে বৃহতের চিহ্ন থেকে যায়, সেই প্রশ্নের নানা উত্তর খোঁজাই ছিল তাঁর অন্বীক্ষা। ভারত ইতিহাস তো পথের পাঁচালি, ছোটো গণ্ডি ছাড়িয়ে তা বিস্তৃত হয় বৃহৎ পরিসরে, অথচ ভিটের রেশটুকু থেকে যায়, রানুর হাত ধরে বিশ্বভবঘুরে অপূর্ব-এর ছেলে কাজল সেই নিশ্চিন্তপুরেই যেন বড়ো হতে থাকে, অথচ অপু চলে যায়, এই জীবন চেতনায় তপনবাবুর ইতিহাসদর্শন সমৃদ্ধ ছিল।

নীহাররঞ্জন রায় বাঙালির ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্ব লিখতে অনিচ্ছুক, জিজ্ঞাসু তপন রায়চৌধুরী লিখে ফেললেন প্রথম গবেষণাগ্রন্থ 'বেঙ্গল আন্ডার আকবর অ্যান্ড জাহাঙ্গির' (১৯৫৩-১৯৬৯)। বইটির প্রথম সংস্করণ ছাপা হয় মধ্যযুগে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের গৌরচন্দ্রিকারূপে। বইতে অনেক খামতি আছে, তপনবাবু জানতেন, সেই সময়েই ওপার বাংলা থেকে পণ্ডিত আহমদ হোসেন দানি বইটির একটি ন্যায্য সমালোচনাও লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রশ্নটি ছিল তীক্ষ্ণ; মোগলবিজিত বাংলার সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে উত্তর ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের নানা অভিঘাতের চরিত্র কী ছিল, সুলতানি বাংলায় সমাজ রূপান্তর বৃহৎ ভারতের টানে কী আকার পাচ্ছিল, গৌড়ীয় গোস্বামী ধর্মমত, পর্তুগিজ সামুদ্রিক বাণিজ্য ও মোগল প্রশাসনিক ক্ষমতার সূত্রে কীভাবে ও কতটুকু বাইরের জগৎ স্মৃতিশাসিত বাঙালির গৃহস্থের ঘরে উকিঝুঁকি দিয়েছিল, এই সব জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়াই ছিল তাঁর ইচ্ছে। সব ইচ্ছে পূরণ হয় না, তাই সন্দর্ভের হুবহু দ্বিতীয় মুদ্রণে এক দীর্ঘ নতুন ভূমিকায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আর্কাইভস থেকে কুল, শীল, জাত-পাত ও বৈবাহিক আদান-প্রদানের নানা তথ্যকে সমাজতত্ত্বের বর্গে বুঝতে চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্য সামাজিক দিনচর্যার ধর্ম ও গুণ চিহ্নিত করে মধ্যযুগীয় বাঙালি সমাজ বিন্যাসের কাঠামোগত অবয়বের পরিচয় দেওয়া। রচনায় দিল্লির মহীশূর শ্রীনিবাস বা আঁদ্রে বেতেই-এর মতো সমাজশাস্ত্র বিশারদ বন্ধু ও সহকর্মীদের চিন্তনের প্রভাব অনস্বীকার্য। পড়লেই বোঝা যায় যে একান্ন সালে লেখা অভিসন্দর্ভ ও উনসত্তর সালে বইটির নতুন লেখা ভূমিকার বিশ্লেষণের ঝোঁক ভিন্নমুখী, Dinchrony ও Synchrony, বিবর্তন ও সমাপতনের টানাপড়েনে দ্বিতীয় মুদ্রণটি দীর্ন। অনুযোগ বা অভিযোগ নয়, বরং সময়ের আবর্তনে বিশ্লেষণের ঝোঁক ও পাঠ্যভ্যাস কীভাবে পালটে যায়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বইটির এই সংস্করণ।

অভিসন্দর্ভের জন্য ডিগ্রী পেয়েই তপনবাবু আর্কাইভস যাওয়া বন্ধ করেননি। ওলন্দাজ ভাষা শিখলেন, সরকারি বৃত্তি নিয়ে অকস্‌ফোর্ড গেলেন, ১৯৫৩-৫৭ সালের মধ্যে হেগ-এর বিরাট আর্কাইভস

“পড়লেই বোঝা যায় যে একান্ন সালে লেখা অভিসন্দর্ভ ও উনসত্তর সালে বইটির নতুন লেখা ভূমিকার বিশ্লেষণের ঝোঁক ভিন্নমুখী, dinchrony ও Synchrony, বিবর্তন ও সমাপতনের টানাপড়েনে দ্বিতীয় মুদ্রণটি দীর্ন। অনুযোগ বা অভিযোগ নয়, বরং সময়ের আবর্তনে বিশ্লেষনের ঝোঁক ও পাঠ্যভ্যাস কীভাবে পালটে যায়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বইটির এই সংস্করণ”

এর নথি ঘেঁটে লিখে ফেললেন সপ্তদশ শতকের ভারতে সামুদ্রিক বাণিজ্যের এক পর্ব, 'ইয়ান কোম্পানি ইন কোরমণ্ডল ১৬০৫-১৬৯০', (১৯৬২), সমুদ্র-বাণিজ্যের ওঠাপড়ার সঙ্গে দেশজ উপকূলের উৎপাদন ব্যবস্থা ও স্থানীয় রাজনীতির সালতামামি ধরে অনুপুঙ্খ আলোচনা এই রচনার বিষয়, সনাতনী অর্থনীতি ও ওলন্দাজ কোম্পানির কর্মকাণ্ডের টানাপড়েনকে পণ্য, বাণিজ্য ও বাজারে চাহিদা-যোগানের রদবদলের বর্গে বোঝার চেষ্টা। তথবহুল আয়াসসাধ্য নিশ্ছিদ্র গবেষণা, ওজনে ভারী। অকস্‌ফোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার গেরেমভারি কৌলীন্যের ছাপটি এই অভিসন্দর্ভের সর্বত্র আছে। (পৃ. ১১) তপনবাবু স্বীকার করেছেন পুরো বইটা কেউ নাই-ই পড়তে পারে, তাই সারসংক্ষেপ আড়াই পৃষ্ঠায় করে দিয়েছিলেন।

এতদিনে গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। কর্মসূত্রে কলকাতা ছেড়ে দিল্লিতে,

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

"তাঁর স্পষ্ট আত্মউপকাব্য হল, 'আমি জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে বুঝেছি যে, ইতিহাসে আবাল্য আমাকে যা আকর্ষণ করেছিল তা হচ্ছে বিষয়টির সাহিত্যরস – অচেনা যুগে অজানা দেশে অপরিচিত মানুষের অর্ধশ্রুত হৃৎস্পন্দন শোনার চেষ্টা।" সমাজ-বিজ্ঞান নয়, সমাজ শাস্ত্রও নয়, মানবিক বিদ্যা হিসাবেই ইতিহাসকে চিনতে ও বুঝতে তপনবাবু স্বচ্ছন্দ ছিলেন। অতএব মন চলো নিজ নিকেতনে"

জাতীয় গ্রন্থাগারে, দিল্লি স্কুল অব্ ইকনমিকসে ও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে, তাঁর ভাষায় তখন জীবনটা 'নরকে এক ঋতু'। আত্মজীবনীতে তিনি তাঁর নরকবাসের কথা সাতকাহন লিখেছেন, দিল্লির সংস্কৃতির সঙ্গে তার মেজাজ খাপ খায় নি, আর রুচি ও সংস্কৃতিতে গরমিল ক্রমশ বেড়ে যাবার জন্য লেখার স্পৃহাই যেন চলে গেল, কলমের কালি শুকিয়ে এল' তাঁর আত্মউপস্থাপনার ভাষাটি এরকমই। পুরোপুরি একমত হওয়া মুশকিল। বাংলা আত্মজীবনীতে তো উল্লেখ মাত্র নেই, কেন জানি না, ইংরেজি ভাষায় লেখা স্মৃতিচারণেও (দি ওয়ার্লড ইন আওয়ার টাইম) একটি অসামান্য কর্ম অভিজ্ঞতার কথা অতি সংক্ষেপে তিনি সেরেছেন। কর্মজীবনে অসুখী ইতিহাসবিদ ব্যাপৃত হয়েছিলেন সাংগঠনিক কাজে, পরিকল্পনা করেছিলেন, ইতিহাসবিদ্যার বিখ্যাত গবেষণা পত্রিকার। ১৯৬০-এর দশকের শুরুতেই তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দুটি শীর্ণ প্রবন্ধ সংকলন, 'কনট্রিবিউসনস্ টু ইন্ডিয়ান ইকনমিক হিসট্রি', সংকলনের প্রথম প্রবন্ধই ছিল আলিগড়ের তরুণ অধ্যাপক ইরফান হাবিবের লেখা 'ব্যাঙ্কিং ইন মুঘল ইন্ডিয়া'। তখনো মোগল কৃষি অর্থনীতির উপর তাঁর জগৎবিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থটি বার হয়নি। স্মরণে আছে যে চেতলা বয়েজ স্কুলে ইতিহাসের শিক্ষক তাপস মজুমদার আমার মতো অপোগন্ড ছাত্রকে উপর্যুক্ত পত্রিকার ঐ প্রবন্ধটা দেখিয়েছিলেন, ভবিষ্যতের জন্য লেখকের নামটি মনে রাখতে বলেছিলেন। প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশের অনতিকাল পরেই ধর্মাকুমারের সহযোগিতায় তিনি সম্পাদনা করে বার করছেন 'ইন্ডিয়ান ইকনমিক এন্ড সোস্যাল হিসট্রি রিভিউ,' নব্য ভারতীয় ইতিহাস রচনার মুখপত্ররূপে গবেষণা পত্রিকাটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে। ইরফান হাবিব, নুরুল হাসান, বিনয়ভূষণ চৌধুরী থেকে রজতকান্ত রায়, মুজাফফর আলম, সঞ্জয় সুব্রহ্মণ্যম বা দীপেশ চক্রবর্তী, সবাই তাঁদের গবেষণার প্রথম একটি ফসল ওই পত্রিকার পাতায় তুলে ধরেছেন। ঐ পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়াটা ষাট ও সত্তর দশকে ভারতীয় ইতিহাসের দেশি ও বিদেশি গবেষকদের কাছে শ্লাঘার বিষয় ছিল। অবশিল্পায়ন বা জাতীয়তাবাদের চরিত্র নিয়ে নানা তর্ক বিতর্কে পত্রিকাটি ভরপুর থাকত। দিল্লিবাস তপনবাবুর কাছে একেবারে উষর মরুভূমি ছিল না।

এরপরেই, ১৯৭৩ সালে তপনবাবু চললেন অকস্‌ফোর্ডের অধ্যাপক হয়ে, প্রবাসে থাকাকালীনই, ওই একই পেশাদারি মান ও উজ্জ্বল্য নিয়ে যথাক্রমে ইরফান হাবিব ও ধর্মাকুমারের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় বার করলেন 'কেমব্রিজ ইকনমিক হিসট্রি অব ইন্ডিয়া'র দুই খণ্ড (১৯৮৬)। অর্থনীতিতে মোগল রাষ্ট্রের সামগ্রিক ভূমিকা বিচারে তপনবাবুর মতটি অন্যতর সম্পাদক ইরফান হাবিবের অভিমতের বিপরীত ছিল অর্থনীতিতে মোগল রাষ্ট্রের কয়েকটি ইতিবাচক দানের প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষন করেন। অবশ্যই তাঁর আলোচনার চিত্তাকর্ষক দিক ছিল অকসফোর্ডে সহকর্মী চীনের ইতিহাসবিশেষজ্ঞ মার্ক এলভিনের গবেষণাসূত্রে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার তুলনা টানা, সেই তুলনার নিরিখে মোগল ভারতের অর্থনীতির চরিত্র বিচার করা। ঐতিহাসিক গবেষণার তাৎপর্য বিচারে কূপমণ্ডুক হয়ে থাকা তপনবাবুর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

এত সব পড়াশোনার মধ্যে তপনবাবু অকস্‌ফোর্ডে ভারতীয় ইতিহাস পঠন পাঠনের ও পাঠ্যসূচিরও খোলনলচে বদলে দিলেন। ভারতীয় ইতিহাসের একদল তরুণ উজ্জ্বল ছাত্র তাঁর তত্ত্বাবধানেই গবেষণা শেষ করেন। তপনবাবুর বিদ্যাবংশটি চোখ ধাঁধানো, যেমন, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, শাহিদ আমিন ও রফিউদ্দীন আহমেদ, সুরঞ্জন দাশ ও রুদ্রাংশু মুখার্জি, তপতী গুহঠাকুরতা ও নন্দিনী পণ্ডা, এবং আরো অনেকে। কীর্তিপাশা ও কলকাতার এক সময়ের বাসিন্দা এক তরুণ বাঙালি ঐতিহাসিক প্রৌঢ় বয়সে আন্তর্জাতিক মহলে ও প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় ইতিহাসচর্চার নিজস্ব স্থানটি কেড়ে নিয়েছিলেন।

কোথায় যেন খিঁচ থেকেই যাচ্ছিল। এত কিছুতেও তপনবাবু অতৃপ্ত ছিলেন। গত দশকের তৃতীয় পাদে যে নব্য ইতিহাসচর্চা ভারতে গড়ে উঠছিল, নানা বিদ্যায়তনে সেই ইতিহাস পরিশীলিত সমাজবিজ্ঞানের ধাঁচের রূপ নিল। তপনবাবুর গবেষণার অন্যতম বিষয় অর্থনৈতিক ইতিহাস, সেই বিদ্যার প্রধান রূপ হয়ে উঠল অর্থনৈতিক তত্ত্ববহুল, সংখ্যাতত্ত্বের নিগড়ে বাঁধা সামাজিক ইতিহাসও সমাজশাস্ত্রীয় নানা বিতর্কের দোসর হল। এই সবই দিল্লিবাসের আমল থেকেই তপনবাবু জানতেন, নব্য কৃৎকৌশলে ও তত্ত্ববিচারে কিছু হাতও পাকিয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত মেজাজটা বেগড়বাই করল, এই ইতিহাস চর্চায় সাফল্য এলেও সেই চর্চায় কোনো রস তিনি ঠিকমতো উপভোগ করতেন না, নিজের রচনাগুলি যেন বিশ্লেষণী কেজোমিতে পর্যবসিত হচ্ছিল। তাঁর স্পষ্ট আত্মউপলব্ধি হল, 'আমি জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে বুঝেছি যে, ইতিহাসে আবাল্য আমাকে যা আকর্ষণ করেছিল তা হচ্ছে বিষয়টির সাহিত্যরস – অচেনা যুগে

অজানা দেশে অপরিচিত মানুষের অর্ধশ্রুত হৃৎস্পন্দন শোনার চেষ্টা।'' সমাজ-বিজ্ঞান নয়, সমাজ শাস্ত্রও নয়, মানবিক বিদ্যা হিসাবেই ইতিহাসকে চিনতে ও বুঝতে তপনবাবু স্বচ্ছন্দ ছিলেন। অতএব মন চলো নিজ নিকেতনে।

এই ফিরে যাবার তাগিদেই তিনি লিখলেন, 'ইয়োরোপ রিকনসিডার্ড (১৯৮০) কীভাবে বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের মতো বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা ইউরোপীয় সংস্কৃতির আহ্বানে সাড়া দিচ্ছেন, নতুনকে চয়নের নিজস্ব শর্তগুলি কীভাবে ই বা বাঙালির বুদ্ধিচর্চায় ঘর ও বাইরের সন্ধি, সমবায় ও সংঘর্ষের আকার নিচ্ছে। এই উনিশ শতকীয় ভাবধারার 'রাসায়নিক প্রক্রিয়া'টা কী ছিল, ভাবগুলি কী করে কতটুকু প্রতিসরিত হয়ে বাঙালি গৃহস্থের মননে, পারিবারিক দিনচর্যা ও জীবনযাপনের মধ্যে অন্তঃশীল ছিল, সেই ইতিবৃত্তে তিনি আগ্রহী হয়ে উঠলেন। গ্লোবাল ও বাঙালের যোগবিয়োগের প্রেক্ষিতে বেরলো বাঙালি মানসিকতা নিয়ে প্রবন্ধ সংকলন, 'পারসেপশনস্, ইমোশনস্ এন্ড সেন্সিবিলিটিজ' (১৯৯৯)। এই গবেষণারই সরস প্রকাশ আমরা কয়েকটি বাংলা নিবন্ধেও দেখি সেগুলি সংকলিত হয়েছে তাঁর 'প্রবন্ধ সংগ্রহ'তে, (২০০৯)। যেমন, খাদ্য ও পানে ঘোর আগ্রহী ছিলেন তপনবাবু, অগ্রজ-প্রতিম একদা সহকর্মী সুকুমার সেনের মতো তাঁরও বিশ্বাস যে কোনো সংস্কৃতিতে প্রবেশ করার একটি প্রকৃষ্ট পথ রসনা বিচার। যৌবন থেকেই তাঁরা তাঁদের মতটি প্রকাশ করে চলেছিলেন। কলেজ ম্যাগাজিনে তপনবাবুর প্রথম প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল, বিষয় 'মোগল আমলে খানাপিনা'। শব্দ-বিচার করতে গিয়ে সুকুমার সেনও লিখেছিলেন, 'শব্দের মৃগয়ায় মিষ্টান্ন'। মিষ্টির রস থেকে প্রেমরস জীবনকে কীভাবে সমৃদ্ধ করে, তার আভাসও দুই রসিক পণ্ডিত চকিতে দিয়েছেন। তপনবাবু লিখেছিলেন 'প্রেমের বিচিত্র গতি', আর সুকুমার সেন ব্যাখ্যা করেছিলেন ভারতীয় রচনায় 'কামরস'-এর কথা। জগৎ রসময়, রসে বশে থাকাটাই বাঙালি গৃহস্থ ভদ্রলোকের মনোজগতের এককালীন আদর্শ ছিল, এইরকম ধারণা দুইজনের লেখাতেই পাই। মাতৃভাষায় জোরের সঙ্গেই তপনবাবু তাঁর এই বক্তব্যকে পেশ করেছেন। বক্তব্যকে আরো পোক্ত করে ইংরেজিতে লেখার ইচ্ছে ছিল, সেই কাজটুকু আর শেষ হল না। প্রকীর্ণ প্রবন্ধেই তাঁই স্বকীয় চিন্তার নিদর্শন থেকে গেল।

'নিজ মৌজা কীর্তিপাশা, তারই 'রোমহর্ষক ইতিহাস'। বাংলা ভাষায় লেখা তাঁর প্রথম পুস্তিকার নাম 'রোমন্থন ও ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিতচর্চা' (১৯৯৩), আমার মতো অনপড় পাঠকের চোখে তাঁর শ্রেষ্ঠ ইতিহাসকীর্তি। বরিশালের সমাজ ও সংস্কৃতির উপর লেখা সন্দর্ভটির পরিসরে সব গোত্রের মানুষরা আছেন, বংশের সফল পূর্বপুরুষ জমিদার প্রসন্ন সেন ও তস্য গৃহিনী জাঁদরেল ষষ্ঠীপ্রিয়া থেকে রোমাই কার্তিক, নমঃশূদ্র ও মুসলমান চাষা, নগা, বগা ও ধর্মার দল। প্রথাগত আর্কাইভসের নথির বাইরে, আগমার্কা তথ্য-এর খুঁটিনাটি বিচারের গণ্ডি ছাড়িয়ে বংশাবলী, পরস্পরবিরোধী কিংবদন্তী, অতিপ্রাকৃত কাহিনি, বরিশালী বাগধারা, আবার নিজের বানানো নতুন শব্দে কথাকণিকার বুনটে তৈরি তাঁর লেখা এই বই, টক-ঝাল-মিষ্টির স্বাদে ভরপুর। স্মৃতির একরূপ মাত্র আর্কাইভস -ভিত্তিক ইতিহাস, স্মৃতির আরও অনেক রূপ আছে। অনেক সময়ই সেইগুলির আকার খণ্ড, ধারাবাহিক নয়, কালিক বিচারে অসম, তথ্য বিচারে নড়বড়ে। এই সব খণ্ডিত উপাদানকে নিয়ে তপনবাবু আখ্যানকৌশলে গতশতকের বরিশালের সংস্কৃতি ও সমাজের ত্রিশ ও চল্লিশের পর্বে ফিরে গেছেন। অতীতের কীর্তিপাশার লোকেরা দেশজ ভাষায় তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে, গালগল্পের মাঝে মাঝে ফুটে উঠেছে এক আসন্ন ক্রান্তিকালের অজানিত শঙ্কা ও অস্বস্তি। বইটির জায়গায় জায়গায় তপনবাবুর ইতিহাস চর্চার অভিজ্ঞতা টীকা-টিপ্পনীর মতো কাজ করেছে। উদাহরণ দেওয়া যাক। যেমন, বাঙালি জমিদার মহিমা বর্ণনায় তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। বাঙালি জমিদাররা খাঁটি উত্তরভারতের মোগলাই সামন্তদের তুলনায় 'ছাপোষা'

> *''অগ্রজপ্রতিম একদা সহকর্মী সুকুমার সেনের মতো তাঁরও বিশ্বাস যে কোনো সংস্কৃতিতে প্রবেশ করার একটি প্রকৃষ্ট পথ রসনা বিচার। যৌবন থেকেই তাঁরা তাঁদের মতটি প্রকাশ করে চলেছিলেন। কলেজ ম্যাগাজিনে তপনবাবুর ভ্রমন প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল, বিষয় 'মোগল যুগে খানাপিনা'। শব্দ-বিচার করতে গিয়ে সুকুমার সেনও লিখেছিলেন, 'শব্দের মৃগয়ায় মিষ্টান্ন'। মিষ্টি'র রস থেকে প্রেমরস জীবনকে কীভাবে সমৃদ্ধ করে, তার আভাসও দুই রসিক পন্ডিত চকিতে দিয়েছেন''*

ছিলেন, 'কর্ণ-বালিস' সাহেবের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চাপে সরকারের কাছে 'সিক্ত মার্জার' হওয়া ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর ছিল না, হামবড়াই ভাবটি অনেক সময়ই ভাঙা বা শূন্য কলসীর ঠনঠনে আওয়াজ ঠেকত। এই মধ্যবিত্ত জমিদার বাড়ির ঠাটবাটেই গ্রামের হতদরিদ্র কৃষকরা অবাক হত। বর্ষায় ধান রুইতে রুইতে বরিশালী চাষিরা ভাবত যে বৃষ্টি শুরু হতেই পান্তাভাত খেয়ে কাঁথামুড়ি দিয়ে মহারানী ভিক্টোরিয়া উবুড় হয়ে ঘুম দিচ্ছেন। সুখচিন্তার এহেন তুচ্ছ সীমাই ঔপনিবেশিক আমলের শেষ পর্যায়ে বাঙালি চাষির গভীর দরিদ্রতার পরিচয় দেয়, এই টিপ্পনটুকু তাঁর বিবরণের মধ্যে তপনবাবু বসিয়ে দেন। ব্যক্তি অভিজ্ঞতা, কথাকণিকা ও ঐতিহাসিক টিপ্পনীর মিশেলে একটি এলাকার সাধারণ জীবন ও সংস্কৃতির এই গোত্রীয় নির্মিতি বাংলা ভাষাতে তো নয়ই,

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

অন্য কোনো ভারতীয় ভাষাতেও আর কেউ লিখেছেন বলে আমার জানা নেই।

নিখিল সরকার-এর কাছে লেখা তপনবাবু সদ্য প্রকাশিত এক চিঠিতে জানা যায় যে তিনি তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় বইটির নাম প্রথমে রেখেছিলেন 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'। পরে ভেবে চিন্তে নামটি বদলে দেন, নাম হয় 'বাঙালনামা'। তাঁর এই সফর নামার বর্ণনাটি দীর্ঘ, বেশ কিছু ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতা তিক্ত ভাষাতেই লেখা হয়েছে। পড়লে মনে হয় যে তাঁর ধারণা ছিল, ঘর থেকে বাইরে যেতে গেলে দরজা ভালো করে খুলতে হয়, চৌকাঠ পেরোতে হয়, আঙ্গিনা পরিষ্কার করতে হয়। সূঁচ তোর পেছনে কেন গর্ত, বলার সময় নিজের চালুনিটা দেখে নেওয়া ভালো। একদিকে নানা আদর্শ মানুষের সান্নিধ্যের কথা তপনবাবু এই স্মৃতিকথায় বলেছেন, তাঁদের সান্নিধ্যে তিনি ঋদ্ধ হয়েছেন, আবার কিছু কিছু 'অমায়িক খচ্চর' কেও ছেড়ে কথা বলেননি। আত্মবিশ্বাসী, সুস্থ, যুক্তিবাদী ও বর্হির্মুখী জাতীয়তাবাদ কীভাবে একজন ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর সাংস্কৃতিক প্রত্যয়ে পরিণত হতে পারে, সেটাই এই আত্মকথার বাংলা ও ইংরাজি বয়ানে ঘুরে ফিরে এসেছে। সন্দেহ নেই যে জীবনের সায়াহ্নে দেশের বাস্তব পরিস্থিতিতে ঐ প্রত্যয়টিতে চিড় ধরেছিল, সাংস্কৃতিক সংকীর্ণতার নানা প্রকাশে তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন, পারলেই গৈরিক উত্থানের বিরুদ্ধে মুখে বা লিখে সতর্কবাণী উল্লেখ করতেন। বরিশাল থেকে একদা উদ্বাস্তু, জমিদার তনয়, বিংশ শতকের এক রুচিবান বাঙালি, অকস্‌ফোর্ডবাসী এই ইতিহাসবিদ সারস্বত সাধনায় মুক্তমনা হবার জন্য বার বার যেন নিজের মধ্যেই ঘর ও বাহির, ইতিহাসবোধ ও জীবনবোধ-এর সম্পর্ক খুঁজেছেন। নিজেকে চেনা ও খোঁজা তো কখনোও ফুরোয় না, তারই সঙ্গে স্বকাল ও স্বসমাজকে জানা।

সূত্রনির্দেশ :

(বর্তমান আলোচনাটি আনন্দবাজার পত্রিকাতে (৩০ নভেম্বর, ২০১৪) প্রকাশিত 'গ্লোবাল বাঙাল' প্রবন্ধটির পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ।)

১। তপন রায়চৌধুরী, **'ভারতচিন্তা'** প্রবন্ধ *সংগ্রহ*, কলিকাতা, আনন্দ, ২০০৩, পৃ ২০।

২। তপন রায়চৌধুরী, *'বাঙালনামা'* আনন্দ, ২০০০, পৃ ২৯১।

৩। তপন রায়চৌধুরী, *রোমন্থন* ও *ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিত চর্চা*, আনন্দ, ১৯৯০, পৃ ১৫-১৬ ও পৃ ৩৯।

প্রাক্তনী (ইতিহাস/ ১৯৬৫-৬৮)

অধ্যাপক, সেন্টার ফর স্টাডিস ইন সোস্যাল সায়েন্সেস্‌

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073